PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-2, Nov 2021

বৈশ্বিক সত্য- "বিসর্জনের সত্য"

ড. সুফল বিশ্বাস [1]*

[1]* *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি*

বিমূর্ত

"...ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্যের মতন ধর্ম চির জোতির্ময়
চিরকাল আছে।"

(মালিনী : রবীন্দ্রনাথ)

গোটা পৃথিবী জুড়ে বর্তমান যে সমস্যা আজ সবচেয়ে বড়ো তা হল আচার সর্বস্ব ধর্মকেন্দ্রিক আগ্রাসন বনাম মানব ধর্মের আত্মরক্ষার লড়াই। ধর্ম নিয়ে তার আচার নিয়ে তাকে বর্মের মতো ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্মেরই মৌলবাদী গোষ্ঠী নিজেদের পছন্দ মত আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে নিয়ত। দেবতার নামে বা তাকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট মানব ধর্মের প্রকৃত রূপরেখা অঙ্কন করা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যায় আজ গোটা পৃথিবীর মানব জাতির মধ্যে দেখা দিচ্ছে নানা অস্থিরতা। পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে এই অস্থিরতার সংক্রম ঘটেনি। কোনটা প্রকৃত পথ, কোন পথের আশ্রয়ে মিলবে প্রকৃত মাবব ধর্ম সত্যের অমৃত ফল তা নিয়ে চলেছে রক্তপাত হানাহানি।

ধর্মের কালো দিক যা প্রকৃত মানব ধর্মের প্রবল স্রোতাবেগকে অস্বীকার করে নিয়ত বেড়ে চলেছে তার সংরক্ষণকারীদের সঙ্গে প্রকৃত মানব ধর্ম বিকাশকারীদের লড়াই চলছে---স্বাস্থকর লড়াই নয়, যুক্তি তর্কের লড়াই নয়, একেবারে যে বিরুদ্ধবাদী তাকে নিকেশ করার লড়াই। যে লড়াইয়ে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীক--- আন্তঃরাষ্ট্রীক নানা স্তরে ক্রমে বেড়ে চলেছে নানান অস্থিরতা। ধর্ম হয়ে উঠেছে নানা আচার সর্বস্ব বেণের হাতের ইস্কাবনের টেক্কা। ধর্মের নামে একই সম্প্রদায় একে-অপরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মেতে উঠেছে। দেবতার নামে তারা আসুরিক প্রবৃত্তিকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের লাভালাভের হিসেব নিকেশ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। শুধু বিশেষ এলাকা বা গেষ্ঠী নয়, অনেক সময় রাষ্ট্রও হয়ে উঠেছে তার ছত্রধর, কখনো বা নিয়ন্ত্রা। এই ধর্ম সন্ত্রাস অনেক সময়ই সাংসৃকতিক সন্ত্রাসের বেশ ধরে গোটা পৃথিবীকে করে তুলছে অস্থির। যার ছোবলে রক্ষা নেই পৃথিবীর কোনো প্রান্তের, কোনো অংশের।

চুম্বক শব্দ: বিশ্ব, ধর্ম, বিনাশ, সন্ত্রাস, মানব, সভ্যতা

প্রশ্ন উঠতে পারে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে ওঠা বিশ্বে আচার সর্বস্ব ধর্মের বিশেষ দিকের এত বাড় বাড়ন্ত কেন? আসলে ধর্ম নিয়ে কালে কালে যে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ইতিহাস দেখা গেছে আজকের বিশ্ব আসলে তারই বিবর্তিত প্রত্যয়। কারণ ধর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করে শোষণ, বঞ্চনা, শাসন, হত্যা, কোনো জাত বা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যত সহজ এবং অনেকের

কাছে তার সহজ ব্যাখ্যার রসদ তৈরি করা যেমন সহজ তেমন আর কোনো বিষয় দিতে পারে না। তাই ধর্মের আচ্ছাদনই হয়েছে অনেক সময় শাসকের, ধর্ম ব্যবসায়ীর, কোনো শক্তিশালী জাত বা জাতির তুরুপের তাস। সহজে বা কারণে অকারণে খেলা এই তাসই আজ নতুন রঙে নতুন রূপে গোটা বিশ্বের কাছে হয়ে উঠছে ধ্বংসাত্মক কালোশক্তি। যার বিনাশকারী শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতিনিয়ত কিন্তু তাকে বিনাশের পথ আবিষ্কার করতে পারছি না। এ যে আগামী বিশ্বের পক্ষে কতো বড়ো ট্রাজিক পরিণতির জন্ম দিতে পারে তার স্বরূপ কল্পনা করে শুধুমাত্র আমরা নিয়ত শিহরিত হচ্ছি।

আসলে বর্বর এক জীবশ্রেষ্ঠকে প্রকৃত মানবতার শিকলে বাঁধার জন্য, সে যে পশুর থেকে আলাদা, সে কিভাবে প্রকৃত শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে সুস্থির হবে এবং নিয়ত অস্থির চিত্তের প্রকৃত প্রশমনের সুস্থ রাস্তা খুজে পাবে তার দিক নির্দেশ ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন সময়ে মানুষই জানিয়ে গেছেন, মানুষের জন্য। তারমধ্যে শুষ্ক আচার যেমন ছিল তেমনি সেই শুষ্ক আচারের সুস্থ ব্যাখ্যাও ছিল। কিন্তু মানুষেরই কালোশক্তির মানসিকতা সেই আচারের ভুল ব্যাখ্যা করে নিজের ভেতরে নিরন্তর চলা অস্থির বিক্ষোভকে আরো বহুগুণ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাতে সে শুধু নিজেই বিক্ষুব্ধ হয়নি তার আশে পাশের অন্যজনকে অন্য অংশকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলে নিয়ত অস্থির করে তুলেছে। প্রত্যেক ধর্মেই মানবের ভেতরে জন্ম নেওয়া অস্থির রূপ রিপুকে দমন করার কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বা তাদের ধ্বংস করতে। কিন্তু কোথাও এই আত্মার এই বিনাশকারী রূপকে মারতে বা দমন করতে অন্য আত্মাকে বলি দেবার কথা বলা হয়নি। অথচ, আচার সর্বস্ব কিছু মানুষ তাকে বিভিন্ন প্রাণীর রূপকে বেঁধে নির্বিচারে নিরিহ পশু হত্যা চালিয়ে গেছে। কিন্তু আজকের অতি আধুনিক বিশ্ব আরো একধাপ এগিয়ে গেছে এই হত্যার রূপককে অন্য রূপকে বাঁধতে। নিরিহ পশুতো কোন ছার এক জাতির বা সম্প্রদায়ের মানুষ আর এক জাতির মানুষকেও ধর্মের এই কালোশক্তির রূপকে মারতে দ্বিধা করছে না। বিশ শতকে ফ্যাসীবাদের জনক হিটলার জাত্যাভিমানের অহংকারে যে মানব নিধন যজ্ঞ করেছিল নিজের ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে তাও ধর্মের মোড়কেই আচ্ছাদিত ছিল। তাতে তার যে যুক্তি ছিল তার সমর্থনের লোকও কম ছিল না। কিন্তু তা গোটা বিশ্বে যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছিল এবং তার যে বিচিত্র নানা উইং তৈরি হয়েছিল তার ঝাপটানোর আওয়াজ আজও কিন্তু বেশ প্রাসঙ্গিক।

শুধু রিপুর বিনাশকারী ধর্ম আচ্ছাদনই নয়, শাসক বিভিন্ন সময়ে দেবতার অসীম কৃপাকে ব্যবহার করেছে নিত্য নতুন বোতল বন্দী একই মদের নানা নামের রূপকে। শাসনের নামে অজস্র মৃত্যু সংঘটনের সূত্রে সে দেবতার এই কৃপাকে ব্যবহার করেছে ইচ্ছে মত। কেউ হরিকে ব্যবহার করেছে নিজের পাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে। আবার কেউ বা রাতের অন্ধকারে বোমারু বিমানের আঘাতে অজস্র মৃত্যুর থেকে পাওয়া রক্তমাখা হাত মুছতে ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ 'কনফেশন'কে ব্যবহার করেছে দিনের বেলায়। আবার কেউবা জিহাদের নামে অজস্র হত্যালীলা সংগঠিত করে দেবতার যুক্তি ব্যবহার করে শুদ্ধ হতে চেয়েছেন। ধর্ম ও দেবতা এমন ভাবে সভ্যতায় জড়িয়ে গেছে আচারের নামে, যে তাকে আলাদা করে প্রকৃত মানব ধর্মের রূপ সবার হৃদয়ে জাগরণ না করলে হয়তো গোটা পৃথিবীটার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে পড়বে----যার প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাবে নিরন্তর বেড়ে চলা অকারণ অস্থিরতা। যার থেকে মুক্তি নেই কোন জাত বা জাতির, প্রদেশ বা দেশের---সে গ্রাস করবে গোটা মানব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে।

গোটা পৃথিবী জুড়ে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন প্রথাধর্ম বড় না মানব ধর্ম বড়। গোটা পৃথিবীর মধ্যে যে আরো অসংখ্য পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে প্রতিনিয়ত তার জন্মের মূলেও আছে এই প্রথাধর্ম আর মানব ধর্মের লড়াই। আর সবচেয়ে বড়ো বিপদ লুকিয়ে আছে এই ধর্ম কেন্দ্রিক হানাহানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বড়ো মেজো সেজো রাষ্ট্রের লাভালাভ অঙ্কের রাজনীতি। তাই বিপদটা মানব সভ্যতার স্থয়িত্বের প্রশ্নে আজ গোটা পৃথিবীরই মাথা ব্যাথার কারণ। কারণ প্রযুক্তির সুফল প্রয়োগে আজ গোটা পৃথিবীই চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। কামান-বন্দুক বা সমরসজ্জা এখন আর যুদ্ধ ঘোষণার অন্যতম শর্ত নয়। কয়েকটি বোতামের অপপ্রয়োগেই বা অশুভ বার্তার বৈদ্যুতিন প্রকাশই পৃথিবীর যেকোনো এলাকার অস্থিরতা তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তাই আজকের লড়াইটা আরো বেশি কঠিন। তাই যেকোনো মূল্যে মানুষের মূল্যবোধ তৈরির জন্য তার প্রয়োজন প্রকৃত মানব ধর্মের শিক্ষা। আচার ধর্মের ব্যবহার হোক মানব ধর্মের অভিযোজনের মূল সূত্র এই শ্লোগান গোটা পৃথিবীর মানব জাতির মূল শ্লোগান না হলে গোটা পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য থাকবে না বলে বিশ্বাস হয়।

প্রকৃতপক্ষে আচারধর্ম না মানব ধর্ম বড় এই প্রশ্নটা কিন্তু তোলার কথা ছিল না কারণ কোনো ধর্মের মূল কথাই ছিল সুনির্দিষ্ট আচরণীয় ধর্মের মাধ্যমে মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা বর্বর অসভ্য মানব জাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সুস্থ আচার প্রবিষ্ট করে বিভিন্ন ধর্ম প্রবক্তাগণ আসলে মানবের জীবন চর্যাকে পরিশীলিত পরিমার্জিত করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সুস্থ মানবিক অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ। আচারধর্ম ছিল অবশ্য অনুকরণ যোগ্য এক জীবনাচরণ। কিন্তু কালে কালে অসুস্থ কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী বা কিছু ভুল ব্যাখ্যাকারী মানুষ এই আচার ধর্মের শুষ্ক রূপকেই পাখির চোখ করে অন্য জাত বা অন্য মানুষ থেকে নিজেদের গোষ্ঠী বা জাতকে পৃথক করার সূত্র বানিয়ে ফেলল। তারা ধর্মের আসল উদ্দেশ্য যে, বিশ্ব মানবধর্মের প্রকৃত প্রকাশ তার অন্তরের সত্যটাই ধরতে পারলেন না। ফলত শুষ্ক আচার ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে লাগলেন মানব ধর্মকে। আর তাদেরকে সুকৌশলে কাছে টেনে নানান রঙের জামার রাজনীতি জন্ম দিয়ে আচারধর্ম আর মানব ধর্মের পৃথকীকরণের সূক্ষ্ম খেলায় মেতে থাকলেন প্রতি নিয়ত। গোটা বিশ্বের অস্থিরতার যতগুলো শিকড় একেবারে গভীরে প্রোথিত তার অন্যতম শিকড় এই শুষ্ক আচার ধর্ম আর উদার মানব ধর্মের লড়াই।

প্রকৃত মানব ধর্ম আসলে কি সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞান ছিল একেবারে স্পষ্ট। একটি মানুষের মধ্যে তিনি দ্বৈত মানবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন---প্রাত্যহিকীতে আবদ্ধ মানবের প্রকৃত রূপ, আর প্রাত্যহিকীর বাইরে থাকা মানবের আর এক রূপ। প্রথম সত্তা আপন সিদ্ধি খোঁজে---

> ‘‘মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয় বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবন যাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীব রূপে বাঁচতে চায়।’’১

আর অন্যের খোঁজে নিজের জীবনের চেয়ে বড়ো জীবন। মৃত্যুর মধ্যে যে জীবন দেখতে পায় অমরতার মরাবতী---

> ‘‘কিন্তু, মানুষের আর একটি দিক আছে যা এই ব্যক্রিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা।...সেখানে জ্ঞান উপস্থিত

প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবণতাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে বাঁচতে চায়।" ২

আর এই দুয়ের পার্থক্যের নির্দেশের মধ্যে আছে মানবধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা--- প্রকৃত প্রকাশ,---

"স্বার্থ আমাদের যেসব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে; যাআমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"৩

কিন্তু যত সহজে এই মানবধর্ম শব্দটির উচ্চারণ তার প্রকৃত প্রকাশের তীব্র আলোয় জীবন আলোকিত করার মূলে আছে এক সাধনার কন্টক কঠিন পথ। ব্যক্তি মানুষকে সমকালীন মানব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন এই সাধনার পথ অতিক্রম করে নিজেকে চেনা, অপরকে চেনা---বিশ্বকে চেনা,-

"আমাদের অন্তরে কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তারই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।...সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত ব'লেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু, তার আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাক করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।"৪

সেই সুদীর্ঘ মানব সভ্যতার বিবর্তনের সিড়ি বেয়ে মানুষ ধীরে ধীরে আপন পাশব প্রবৃত্তির বাইরে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে---নিজের সীমা স্বর্গের মধ্যেও সে অফুরন্ত মানব জীবনের একটি একক রূপে নিজেকে সব সময় প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে। সে যে একা নয় বহুর মধ্যে এক স্বতন্ত্র সত্তা, যে সত্তা অন্য সত্তার মধ্যে মিলে ও মিলিয়ে দেবার আবেগেই পৃথিবীতে এসেছে---এই বোধই তাকে বর্বরতার সীমা অতিক্রম করতে শক্তি যুগিয়েছে। যার স্পর্শে নিয়ত অভিব্যক্তির আলোকে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে সর্ব মানবের সুস্থ সুস্থির মানব ধর্মের প্রযোজনার অংশীদারিত্বে অম্লান হতে চেয়েছে। যেখানে কোনো জাত নেই, দেশ নেই, সীমানা নেই, শুষ্ক আচারধর্মের বেড়া নেই, শুধু আছে মানব ধর্মের মঙ্গল আরতি,---সর্ব মানবের মিলন সংগীতের আবাহনে যার পূর্তি ও স্ফূর্তি,---

"অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষ এসে সেই প্রকৃয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহ রক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপন মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্ব মানব যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।...এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।"৫

কোনো এলাকার আচারধর্মের মানদন্ডে, অবশ্য পালনীয় ক্রোধ দীপ্ত পালনীয় শর্তের হুঙ্কারে এই মানব ধর্মের দিক নির্দেশিত নয়। কোনো ভূখন্ডের বেড়াজালে বা নির্দিষ্ট সূত্রের নির্দেশে এই মানবধর্ম নির্দেশিত হয়নি। আচার নয়, হৃদয়ের কাছেই বাধা পড়েছে এর পরিপূর্ণ বিকাশের প্রকৃত অভিব্যক্তি,---

"মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমন্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে।...যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাদের আনন্দ, যাদের আশা, যাদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা, তাদেরই রচনা। তাদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে।...তাদের চিন্তা, তাদের কর্ম, জাতি বর্ণ---নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক---মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খন্ড খন্ড দেশ কাল পাত্র ছাড়িয়ে--- যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।"৬

অবশ্য পালনীয় আচারধর্মের বেড়াজালে যে প্রকৃত মানবধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ একেবারে অসম্ভব---এই বিশ্বাসের ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই টলেনি। তার বিভিন্ন কবিতার দেব ভাবনায় (স্মরণীয় 'দীনদান' কবিতা), বিভিন্ন বক্তৃণতা মালায় বারে বারে সেই বিশ্বাসকে আমরা দীপ্ত হতে আমরা দেখেছি। আচার ধর্ম যে নিয়ত অস্থিরতার বীজ রোপণ করে চলে, প্রকৃত মানবধর্মের প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয় তা তার বহু রচনায় বিভিন্ন রূপকে ও প্রতীকে প্রতিফলিত হয়েছে বারে বারে। আলোচ্য 'বিসর্জন' নাটকের মূল দ্বন্দ্বটাই দেখানো হয়েছে প্রথা বা আচার ধর্মের সঙ্গে উদার মানব ধর্মের দ্বন্দ্বে। বিশ শতকের প্রথম লগ্নে বসে তিনি সভ্যতার যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজও আধুনিক বিশ্বে সেই সত্য আরো প্রবল ভাবে প্রাসঙ্গিক। সমগ্র বিশ্বে অস্থিরতার যতগুলো মানদন্ড আজ চিহ্নিত তার সবগুলোতেই এই মানদন্ডের প্রাসঙ্গিকতা আজ প্রবল ভাবে চর্চিত।

'বিসর্জন' নাটকে আচারধর্ম ও মানবধর্মের একদিকে আছে রঘুপতি, গুণবতী আর অপর দিকে আছে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা। আর দুইধর্মের কোনটি গ্রহনীয়, কোনটি গ্রহনীয় নয়, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত জয়সিংহ। রঘুপতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আচার ধর্মের প্রতিপালক আর তার সহায়ক শক্তি রাজশক্তি---স্বয়ং রাজরাণী। রাষ্ট্রীক শক্তি যদি আচারধর্মের প্রতিপালক হয় তাহলে তা যে কতখানি মানবধর্মের বিরোধী হতে পারে রঘুপতির চরিত্র বিশ্লেষণে আমরা সেটাই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমান বিশ্বের বহু রাষ্ট্রশক্তিই আজ আচারধর্মকে ব্যবহার করছে চিরকালের মানবধর্মের বিরোধীশক্তি রূপে। অজস্র রঘুপতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আচারধর্মের মুখ হয়ে আজ গোটা বিশ্বের কাছেই আতঙ্কের কারণ। আর বহু রাষ্ট্রশক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা এলাকা বিস্তারে ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে আজ অজস্র রঘুপতির পৃষ্টপোষক। গুণবতী ও রঘুপতির রসায়নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন প্রায় একশো বছর আগেই। তবে নাটকে একথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন রাষ্ট্রশক্তি যদি আচারধর্মের পৃষ্টপোষক হয় তাহলে তার প্রবলতাকে আটকানোর জন্য কিন্তু মানবধর্মে বিশ্বাসী রাজশক্তিরই প্রয়োজন

নইলে অপর্ণাদের লড়াই হবে অসম লড়াই। আচারধর্ম জয়ী হবে মানবধর্মের শুভশক্তির ধ্বংস সাধনে। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের পরিকল্পনা এই সত্যেরই পরিচয়বাহী বলে আমার মনে হয়।

জীবনের এক বিশেষ পর্বে গুরু রঘুপতির আচারধর্মই ছিল জয়সিংহের একমাত্র পালনীয় কর্তব্য। গুরুর প্রতিটি আদেশ তার কাছে ঈশ্বরের আদেশ ছাড়া কিছু ছিল না। জয়সিংহের এই আচরণ আজ গোটা বিশ্বের ধর্মবিশ্বাসী বহু তরুণদের কাছেও প্রাসঙ্গিক। বহু ধর্মগুরুদের দেওয়া ধর্ম উপদেশ এবং পালনীয় শুষ্ক আচার তাদের কাছে আজও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শুষ্ক আচারধর্মের প্রবল স্রোতাবেগে এক বড় অংশের তরুণ যুবা আজ দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো স্বততঃ ভাসমান। কিন্তু মজা হচ্ছে এখনো বহু ক্ষেত্রেই অপর্ণাদের আবির্ভাব হয়নি। অপর্ণার আবির্ভাব ঘটলে তাদের মধ্যেও যে জয়সিংহের মতো দোলাচল দেখা দেবেই এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' নাটকে আদ্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।

জয়সিংহের দেলাচল আসলে মানব ধর্মের প্রবল স্রোতাবেগে আচার ধর্মের বহুদিনের পাষাণ প্রাচীরে ফাটল ধরার সত্যতা। গুরুদেবের শিক্ষায় জয়সিংহ জেনেছিল হত্যা বা বলিদান আসলে দেবীর অবশ্য প্রাপনীয় কোনো সত্য। কিন্তু অপর্ণা হঠাৎ আলোকের মতো আবির্ভূত হয়ে সব ওলোট-পালোট করে দিল। জয়সিংহের মধ্যে দেখা দিল হত্যা নিয়ে সংশয়, অস্থিরতা কিন্তু আচার ধর্ম চিৎকার করে বললো,---

"কে বলিল হত্যাকান্ড পাপ।
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জান নাকি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।"৭

আচারধর্মের বহুচর্চিত অস্ত্রের এই আঘাত জয়সিংহের মধ্যে কতটুকু সম্বিত ফিরে এল তা নিয়ে নাটকের পরবর্তী অংশে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেছে। তবে বহু দিনের পুরানো আচারধর্মকে সে ত্যাগ করতে পারেনি পুরোপুরি, তা একসময় ধ্বস্ত হয়ে গেছে এক ঘুম জাগানিয়ার কণ্ঠে,---

"জয় সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে---প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত!---ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?"৮

তাই আচারধর্মের শুষ্ক আবরণ ভেদ করে এক সময় তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে সাধারণ মানবের কণ্ঠস্বর, যার মধ্যে আছে মানব ধর্মের স্ফূরণ,---

"দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে?

তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মতো, শুধু চেয়ে থাকে! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে---সে কি তার কোনো কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি---
সে কোথায় চায়?"৯

কিন্তু তবু আচারধর্ম আর মানব ধর্মের দ্বন্দ্ব তার মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে জীবনের শেষলগ্ন পর্যন্ত। এই দ্বন্দ্বই আজকের বর্তমান বিশ্বের বহু তরুণ প্রাণের মধ্যে নিরন্তর অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে। জয়সিংহের এই দ্বন্দ্ব তারই ইঙ্গিতবাহী বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য এই দুই এর দ্বন্দ্বে মানবধর্ম জিতে গেছে এই সহজ সত্য নাটকের শেষে সহজে উচ্চারিত হলেও বর্তমান বিশ্বে তা ততো সহজ কিনা এই প্রশ্নটাও কিন্তু প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ অপর্ণাদের যেমন বিশ্বে অভাব তেমনি গোবিন্দমাণিক্যেদেরও প্রবল অভাব আজ বর্তমান বিশ্বে। আর এই অভাবের কারণেই তিল তিল অস্থিরতা প্রবল অস্থিরতায় পরিণত হতে চলেছে প্রবল গতিবেগে ছোটা সূচকের মতো। পৃথিবীর কোনো ধর্মেই বলা নেই ক্ষমা হীনতার কথা হিংসার কথা। কিন্তু নিজের ভেতরের খারাপ আত্মাকে বশ মানিয়ে সুস্থ আত্মার প্রকাশকে বরাবর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার জন্য সহায়তা নেওয়া হয়েছে আচারধর্মের কিন্তু সে আচারধর্ম আপাত শুষ্ক মনে হলেও শুষ্ক নয়। কোনো ধর্মে শয়তানকে মারার কথা বলা হয়েছে, কোনো ধর্মে নানা ইবলিশের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সবই বলা হয়েছে রূপকের আড়ালে---সূক্ষ্মতার আড়ালে। কিন্তু কালে কালে ধর্মধ্বজাধারীর এই সত্যের কালো ব্যাখ্যা করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে দেবী কল্পনা আর তার জন্য বলিদানের প্রথা আসলে আচার সর্বস্ব ধর্মের কালো ব্যাখ্যা। পৌত্তলিকতাবাদের সহায়তায় মানবধর্মের বিরোধী সত্যের প্রকাশ। তাই দেবী রূপী পুতুলকে ব্যঙ্গ করেছে অপর্ণা,---

"তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি---কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর-কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে---দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!"১০

অবশ্য এ শুধু ব্যঙ্গ নয়, পরম সত্য। সে সত্যকে চাপা দিয়ে পুতুলের আড়ালে গোটা বিশ্বকে অস্থির করে তোলার অশুভ প্রচেষ্টা চলেছে সর্বত্র। যার প্রতিরোধ করতে হলে প্রকৃত মানবধর্মের স্বরূপের প্রচার জরুরী। আর সেই প্রচারের জন্য বর্তমান বিশ্বে অপর্ণাদের দরকার, যারা সর্বসমক্ষে ভয়ডরহীন হয়ে বলতে পারবেন,---

"বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী!
বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পার না---ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মার সেথা অশ্রুজল!"১১

তার কথা শুনে মানুষ জানবে আচারধর্মের অসারতার কথা, প্রকৃত মানবধর্মের স্বরূপের কথা। শুধু সাধারণ মানুষ নয় রাজশক্তিও তার প্রেমের শক্তির কছে মাথা নত করে নিজের মতোই আচারধর্মের বিশ্বাসী শক্তিকে নিজের পক্ষে এনে বলবে মানবধর্মের কথা,---

"যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।"১২

'বিসর্জন' নাটকে বিশ্ব অস্থিরতার এই মূল সন্ধানের পাশাপাশি তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রকৃত সূত্রও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য নাটকের মতো এভাবেই আগামী বিশ্বকে জানিয়েছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মূল 'বিসর্জন' নাটক লেখার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর তিনি লিরিকের বাড়াবাড়ি কমিয়ে নাটকটির অনুবাদ করেন Sacrifice' নামে। আর অনুবাদটা তিনি করলেন এমন এক সময় যখন গোটা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে লোভানলে পোড়ানো লাভালাভের জটিল অঙ্কের খেলায় ঘটে চলা নিরন্তর রক্তপাত, হানাহানি, দখলদারী। পরবর্তীকালে প্রেমের কাছে প্রতাপের পরাজয়ে যে দেবীকে গোমতীর জলে বিসর্জিত করা হয়েছিল তার মন্দির প্রাঙ্গণে নিরন্তর ঘটে চলা রক্তপাত আসলে সমসাময়িক বিশ্বে সংঘটিত নানা ধরণের বলির রক্তপাত---প্রতাপের কাছে প্রেমের বশ্যতা স্বীকারে সে নিরন্তর রক্তক্ষরণ গোটা বিশ্বে ঘটেছিল তা কলঙ্কিত করেছিল বিশ্ব মানবতাবোধকে। শান্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ক্ষুধান্নের জন্য আগামী প্রজন্মের রক্ষণের জন্য বিশ্বত্মারা নিরন্তর মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিল তাদের রক্তের মূল্যে যে বৃথা নয় এ বিশ্বাস কবির ছিল। আর সেই বিশ্বাসেই বিসর্জনের ইংরেজি তর্জমায় উৎসর্গপত্রে লেখেন,---

'I dedicate this play to those heroes who bravely stood for peace, when human Sacrifice was claimed for the god of war.''

অন্যায় ও প্রতিবাদকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন, ব্যক্তিক সংঘাত, সমষ্টির সংঘাত,সঠিক সত্যপ্রকাশী প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বকে, 'বিসর্জনে'র বিশ্বমাত্রিক রূপকল্পের Climex' প্রেমের নিগূঢ় প্রবর্তনায় সঞ্জীবিত করে

সমসাময়িক জায়মান অস্থির বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসই বিসর্জন নাটককে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

প্রায় একশ বছর পর আজকের বিশ্বের অস্থিরতা প্রশমনেও 'বিসর্জনে'র রূপ প্রতীক সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রক্ত দেখে এক বালিকার চিৎকার আর তার ঔপন্যাসিক রূপ হয়ে তাই 'রাজর্ষী' বেঁচে থাকলো না, Sacrifice' হয়ে গোটা বিশ্বের আচারধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্মের লড়াই এর কাহিনী হয়ে, বিশ্বের যত অস্থিরতার কারণে যত Sacrifice' হয়েছে বা হবে তার রূকাশ্রয়ী শিল্পরূপ হয়ে উঠলো। আজকের আধুনিকতর বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানের সলতে পাকানোর যত আধুনিক উপকরণই তৈরি হোক না কেন যখন দেখি যে মানুষের অন্ধত্ব কাটেনি, যে অন্ধত্ব মানবধর্মের স্থিরত্বকে উপেক্ষা করে অধর্মের পীঠে সওয়ারী করছে বিশ্বকে এবং আরো ক্রম অস্থির করার প্রয়াসে রাজনীতির কারবারীরা ছোট ছোট পৃথিবীর জন্ম দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে আরো 'গভীরতর অসুখে' মোড়া অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ঠিক বুঝি 'বিসর্জনে'র রূপক প্রতীকের সত্যতা কতখানি। শুধু অন্ধকার লোভী ধর্মের কারণে অকারণ রক্তপাত, কোনো ধর্ম গ্রহণীয় বা গ্রহণীয় নয়, গ্রহণ করলে অস্তিত্বের সংকট হবে কিনা--- এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ক্রম অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে, যখন দেখি নানা স্থানিক বর্ণমালার বর্ণিকের চিত্রে, তখন বুঝি 'বিসর্জনে'র বিচারের মানদন্ড কি।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১. মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. মানুষের ধর্ম, ঐ।
৩. মানুষের ধর্ম, ঐ।
৪. মানুষের ধর্ম, ঐ।
৫. মানুষের ধর্ম, ঐ।
৬. মানুষের ধর্ম, ঐ।
৭. বিসর্জন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. বিসর্জন, ঐ।
৯. বিসর্জন, ঐ।
১০.বিসর্জন, ঐ।
১১. বিসর্জন, ঐ।
১২. বিসর্জন, ঐ।